LEARN GEETA
तस्मात् योगी भवार्जुन

॥ श्रीहरि ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 18: মোক্ষসন্ন্যাসযোগ

3/6 (শ্লোক 16-28), শনিবার, 14 অক্টোবর 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ ড: সঞ্জয় মালপাণী মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/GlVFC06LvKg

জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার ত্রিবিধ প্রকার

পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রার্থনা করে, দীপ প্রজ্জ্বলন এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে মোক্ষসন্ন্যাসযোগ নামের অধ্যায়ের বিবেচন সত্রের শুভারম্ভ হয়।
গীতা পাঠের আমাদের এই তরণী এখন নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। শ্রী ভগবান তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমাদের কাছে জীবনের সবচেয়ে গভীর রহস্য ব্যাখ্যা করছেন।

18.16

তত্রৈবং(ম্) সতি কর্তারম্, আত্মানং(ঙ্) কেবলং(ন্) তু য়:
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্, ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥16॥

এতৎসত্ত্বেও যে-ব্যক্তি অশুদ্ধবুদ্ধি হেতু ঐ কর্ম সম্পাদনে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকেই কর্তা বলে মনে করে, সেই মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক ঠিক বোঝে না। ১৬

18.17

য়স্য নাহংকৃতো ভাবো, বুদ্ধির্য়স্য ন লিপ্যতে
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্,ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥17॥

যে-ব্যক্তির অন্তঃকরণে 'আমি কর্তা' এই ভাব নেই এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থ এবং কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকলকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও লিপ্ত হন না (১)। ১৭

শ্রী ভগবান বলেন, যার অন্তঃকরণে কর্তা হওয়ার ভাব নেই, যার বুদ্ধি সাংসারিক কাজে লিপ্ত হয় না, এমন ব্যক্তি, দুর্বৃত্তকে হত্যা করেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং সেই পাপের অংশীদারও হন না। এই কথা ভগবান অর্জুনের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানুষের বিবেককে

জাগ্রত করে।

যে ব্যক্তি দুর্জন ও সন্ত্রাসবাদীকে সমর্থন করে সে নিজেও দুরাত্মা ও সন্ত্রাসবাদী, তাই এই ধরনের মানুষকে হত্যা করার মধ্যে কোনো পাপ নেই। ভগবান বলেন, আমি জানি বীর শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তোমার পিতামহ, দ্রোণাচার্য তোমার গুরু, কিন্তু এরা সকলেই, রাজসভায় দ্রৌপদীকে যিনি অপমান করেছে, সেই দুর্যোধনকে সমর্থন করেছিলেন। এরা কেউই অন্যায়ের বিরোধিতা করেননি, তাই এদের হত্যা করা কোনো পাপ নয়, এমন লোকদের হত্যা করা উচিত। এই ধরনের লোকদের হত্যা করার সময় মনের মধ্যে কর্তব্যবোধ থাকা উচিত কারণ আপনি একজন ক্ষত্রিয় এবং একজন ক্ষত্রিয়র দায়িত্ব হচ্ছে অন্যায়কারী ও সন্ত্রাসবাদীদের দমন করা। এতে কোন পাপ নেই। ভগবান বলেছেন আমি কর্তা এই বোধ নিয়ে তাদের বধ করবে না, কিন্তু নিজের কর্তব্য পালন হেতু তাদের হত্যা করতে হবে। নিজের কর্মের কারণে পূর্বেই এদের মৃত্যু হয়ে গেছে। তোমাকে তো আমি শুধুমাত্র নিমিত্তের ভাগী করেছি। তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের জন্য মনে কোনো শত্রুতা রেখে, তাদের হত্যা করা উচিত নয়। তাদের হত্যা করতে হবে কারণ তারা অন্যায়কে সমর্থন করেছেন এবং তুমি ক্ষত্রিয়। দেশ ও দেশের নাগরিকদের রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। এই ধরনের মানুষকে হত্যা না করলে ভবিষ্যতে তারা অন্য নারীদের অপমান করবে। নিরীহ মানুষকে নির্যাতন করবে। সেজন্য দুর্যোধনের মতো মানুষদের তোমায় হত্যা করতে হবে।

যদি তুমি রাজা হওয়ার জন্য এইসব করছো, তাহলে সেটা ভুল, সাংসারিক বিষয়ে নিজের বুদ্ধিকে লিপ্ত করা উচিত নয়। এই কাজ আমি করছি, এই ভাব মনেও আনবে না। নিজেকে জেনে নাও। আমি শরীর নই, আমি আত্মা। শরীরের মাধ্যমে আমরা যে কাজই করি না কেন, তাতে ত্রুটি থাকলেও, তা কোনো আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই, কর্তব্যবোধ থেকে করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের ভালোর জন্য করা হয়েছে। এতে যদি সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়, তাহলে এ ধরনের কাজে কোনো দোষ নেই। তোমার এতে কোন পাপ হবে না, এটা নিয়ে মোটেও চিন্তা করো না।

18.18

জ্ঞানং(ঞ্) জ্ঞেয়ং(ম্) পরিজ্ঞাতা, ত্রিবিধা কর্মচোদনা
করণং(ঙ্)কর্ম কর্তেতি, ত্রিবিধঃ(খ্) কর্মসঙ্গ্রহঃ॥18॥

জ্ঞাতা(২), জ্ঞান(৩), জ্ঞেয়(৪)—এই তিনটি হল সকল কর্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা(৬), করণ(৬), ক্রিয়া(?) এই তিনটি হল কর্মসংগ্রহ। ১৮

শ্রী ভগবান বলেছেন যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই হলো তিন প্রকার কর্মের প্রেরণা। কর্তা, করণ এবং ক্রিয়া, এই হলো তিন প্রকার কর্ম সংগ্রহ (কাজের উপাদান)।

প্রতিটি কর্ম দুটি স্তরে সংঘটিত হয়।
একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাক। আমরা যদি পুরো পরিবারকে নিয়ে কোথাও নিয়ে যেতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের মনে এই নিয়ে বিচার -ভাবনা জাগে। এরপর কোথায় যাওয়া হবে, এই চিন্তা মনের মধ্যে আসে, তার পর কীভাবে যাব, কখন যাব, কি কি জিনিস নিয়ে যাব, এসব কথা মনের মধ্যে চলতে থাকে। এটি হলো প্রথম স্তর, এবার দ্বিতীয় স্তরে এই সমস্ত ঘটনা প্রতাক্ষ ঘটে, অর্থাৎ, বাস্তবে, আমরা যখনই কোনও কাজ করি, প্রথমে সেই কাজটি করার ভাবনা জন্ম নেয়, এটি ভিতরে ঘটে। এর পরে, সেই ভাবনাটি বাইরে আসে এবং একটি ইচ্ছার আকারে দৃশ্যমান হয়।

যে কোন ঘটনা দুটি স্তরে ঘটে, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক।
উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা তৃষ্ণার্ত বোধ করি, তখন আমাদের ভেতরের জ্ঞান জানে যে আমি তৃষ্ণার্ত, তখন জ্ঞান চিন্তন করে উপলব্ধি করে যে জল পান করলে তৃষ্ণা নিবারণ হবে। এই ঘটনা যেহেতু আগেও ঘটেছে তাই এই জ্ঞান আগে থেকেই আছে। এখানে জল জ্ঞেয় হয়ে গেল কারণ এটা জানা গেল যে জল দিয়েই তৃষ্ণা মেটে। আমরা এটা জেনে গেছি, কিন্তু এখানে আমি কে? আমি তো শরীর নই, আমি হলাম আত্মা। আমরা আমাদের চোখ দিয়ে

দেখি কিন্তু দেখছে অন্য কেউ, চোখ তো শুধুমাত্র একটি মাধ্যম। যিনি এটা দেখছেন, তিনি এই শরীরের ভিতরে রয়েছেন, তিনিই জানেন। তিনিই বুঝেছেন যে এটি করতে হবে। এসবই অভ্যন্তরীণে ঘটছে, বাইরে থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়, এই তিনটিই হলো মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া, যা আমাদের মনের মধ্যে ঘটছে। কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়া, এই তিনটি জিনিস বহিরঙ্গে ঘটছে। শরীর এই কাজটি করছে কিন্তু সেটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলি কর্তার অধীনে আছে, কর্তা যেমন বলবে, ইন্দ্রিয়েরা তেমনই করবে। বাস্তবে কর্তা এবং ক্রিয়া দুটিই কর্ম সংগ্রহ করে। কর্তাই কাজ করিয়ে নেয়, এই জ্ঞানের উপলব্ধি হলে কর্তা, অকর্তা হয়ে যায়। প্রতিটি কর্ম আমার শরীরই করছে, আমার আত্মা নয়।

আত্মা সর্বথা শুদ্ধ, নির্বিকার এবং অকর্তা।

তিন প্রকার কর্মের প্রেরণা -
১. জ্ঞাতা: যিনি জানেন, তিনি জ্ঞাতা।
২. জ্ঞান: যার দ্বারা জানা যায়, তা হল জ্ঞান।
৩. জ্ঞেয়: যে জিনিসটি জানা যায় তার নাম জ্ঞেয়।

তিন প্রকার কর্ম সংগ্রহ -
১.কর্তা: যে কাজ করে তার নাম কর্তা।
২.করণ: যে মাধ্যমে কাজ করা হয় তার নাম করণ।
৩.ক্রিয়া : কর্ম করার নামই ক্রিয়া ।

18.19

জ্ঞানং(ঙ্)কর্ম চ কর্তা চ, ত্রিধৈব গুণভেদতঃ
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে, যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥19॥

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলিও তুমি যথাযথভাবে আমার নিকট শোনো। ১৯

ভগবান বলেছেন যে, শাস্ত্রে প্রকৃতির তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে- জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা। আমাদের এই শরীর আটটি জিনিস দিয়ে তৈরি, সব মিলিয়ে মোট তেইশটি জিনিস রয়েছে তবে এটি মূলত পঞ্চমহাভূত দিয়ে তৈরি। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে- নাক, কান, চোখ, জিহ্বা এবং ত্বক। স্পর্শ দিয়ে বোঝা যায় যে কি ঘটবে। চোখ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় এটা কি। কান দিয়ে শুনলে আমরা জানি এটা কিসের শব্দ, জিহ্বা দিয়ে আমরা স্বাদ সম্পর্কে জানতে পারি এবং নাকের মাধ্যমে আমরা সুগন্ধের অনুভব করতে পারি। এই সব হলো পঞ্চ ইন্দ্রিয়। কিন্তু যখন কর্ম ঘটিত হয় তখন তা কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘটে। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। দুটি হাত এবং দুটি পা আছে, কিন্তু আমরা তাদের এক একটি ইন্দ্রিয় হিসাবে গণনা করি। মুখ ও নির্গমনের দুটি ইন্দ্রিয় (পায়ু, উপস্হ), মোট পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, মোট ১০টি ইন্দ্রিয় আছে। এ ছাড়া প্রকৃতি থেকে আমরা মন, বুদ্ধি ও অহংকার প্রাপ্ত করেছি।

শরীরের আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয় আছে, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যা দেখা যায় না সেই মন, বুদ্ধি ও অহংকার রয়েছে, এসবই আমরা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত করেছি। প্রকৃতি জড়, এখানে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রকৃতি কিভাবে জড় হতে পারে কারণ একটি গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে এবং বড় হয়, তাহলে সে কিভাবে জড় হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গাছে পুরুষ তত্ত্ব না আসে, যতক্ষণ না শরীরের মধ্যে আত্মা আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা জড় থাকে। গাছের মধ্যে পুরুষ তত্ত্বটি আসার সাথে সাথে এটি চলমান হয়ে যায়। শরীরের মধ্যে আত্মার প্রবেশ ঘটলেই সে চলমান হয়ে যায়। আত্মা শরীর ত্যাগ করলেই শরীর জড়ে পরিণত হয়ে যায়। তাই প্রকৃতিকেও জড় বলা হয়। প্রকৃতি তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত, ত্রিগুণাত্মক।

তিন প্রকারের গুণ রয়েছে - সাত্ত্বিক, রাজসী ও তামসী। যে নিদ্রিত, যা অন্ধকারে রয়েছে, সেসব হলো তামসী। যে অর্ধ জাগ্রত কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞান নেই, সে রাজসী, তার মনে নিরন্তর একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে মুহূর্তে তার মনের দ্বন্দ্ব শেষ হয়, সে নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথেই তার মধ্যে সদগুণ দৃশ্যমান হয়।
কর্তাও তিন প্রকার, জ্ঞানও তিন প্রকার এবং কর্মও তিন প্রকারের হয়।

18.20

সর্বভূতেষু য়েনৈকং(ম্), ভাবমব্যয়মীক্ষতে
অবিভক্তং(ম্) বিভক্তেষু,তজ্‌জ্ঞানং(ম্) বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥20॥

যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে অবস্থিত এক অবিনাশী পরমাত্মতত্ত্বকে অবিভক্তরূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে। ২০

শ্রী ভগবান বলেন, যে জ্ঞানের দ্বারা একজন ব্যক্তি সকল পৃথক পৃথক জীবের মধ্যে বিদ্যমান একই অবিনশ্বর পরমাত্মাকে দেখতে পায় তাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে।
সমুদ্রে ঢেউ ওঠে, কিন্তু বাস্তবে ঢেউও সমুদ্রেরই অংশমাত্র। ঘটের ভিতরে এবং বাইরে একটিই আকাশ আছে, যাকে আমরা ঘটাকাশ বলি কিন্তু বাস্তবে আকাশ ও ঘটাকাশ এক এবং অভিন্ন। ভিতরে আর বাহিরে একটাই আকাশ। সাগরের ঢেউতেও একই জল থাকে। সেই ঢেউ সাগরে আছড়ে পড়লে তা আবার জলই হয়ে যায়।

মাটির ঘট ভেঙে গেলে ভেতরে বাইরে এক হয়ে যায়। বাইরের বাতাস আর ভেতরের বাতাস এক হয়ে যায়। যিনি এটা জেনে নিয়েছেন যে সমস্ত জীবের মধ্যে একই পরমাত্মা তত্ত্ব স্থিত রয়েছে, তিনি সাত্ত্বিক জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিয়েছেন।

জ্ঞানেশ্বরীতে, জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জী বলেছেন যে সূর্য কি অন্ধকারকে খুঁজতে পারে? বাস্তবে অন্ধকার বলে কিছু নেই। আলোর অনুপস্থিতিই হলো অন্ধকার। যেই আলো অন্ধকারে পৌঁছায়, সাথে সাথে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

নিজের ছায়াকে আলিঙ্গন করা যায় না। ঠিক যেমন আমরা আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখি কিন্তু তাকে আলিঙ্গন করতে পারি না। যে মূর্খ, সে মনে করে যে আয়নার ওদিকে আমিই আছি আর আয়না ভেঙে দিলে নিজেকে আলিঙ্গন করতে পারবো, আয়না ভাঙার সাথে সাথে প্রতিচ্ছবিও অদৃশ্য হয়ে যায়। যতক্ষণ আয়না থাকে ততক্ষণই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। আয়না ভাঙ্গার সাথে সাথে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। সূর্য এবং রশ্মি একই, ঠিক তেমনি ব্যক্তি এবং ছায়াও একই, এইভাবে একজন সাত্ত্বিক ব্যক্তিও সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একই পরমাত্মা তত্ত্ব দেখতে পান। যে এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে নেয়, সে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হলে সারা শরীরে আলো ছড়িয়ে পড়ে, জ্ঞানের আলো। এরূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হয়।

18.21

পৃথক্ত্বেন তু য়জ্‌জ্ঞানং(ন্),নানাভাবান্‌পৃথগ্বিধান্
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু, তজ্‌জ্ঞানং(ম্) বিদ্ধি রাজসম্॥21॥

কিন্তু যে-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুধা-বিভক্ত সমস্ত ভূতে অবস্থিত নানা ভাবকে পৃথক পৃথক রূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে জানবে। ২১

যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন অনুভূতিকে জানে, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে।
উদাহরণস্বরূপ : কেউ যদি সোনার অলঙ্কার তৈরি করিয়ে তারপর স্বর্ণকারকে জিজ্ঞেস করে যে সোনা কোথায় আর

স্বর্ণকার যখন বলে যে এই অলঙ্কারটাই সোনা, তখন সে যদি উত্তর দেয় যে এটা তো অলঙ্কার, তাহলে সোনা কোথায়? মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করলে মাটি দেখা যায় না, তখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মাটি কোথায় গেল? মাটি ও পাত্র তো একই, ভিন্ন নয়, ঠিক একইভাবে এই সংসারে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী থাকলেও প্রত্যেকের মধ্যে একই পরমাত্মা তত্ত্ব রয়েছে, সকলেই তাঁরই স্বরূপ। আত্মা হল পরমাত্মারই বীজ।

আমরা যদি একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরে আরেকটি মোমবাতি রাখি, তবে আমরা দুটি মোমবাতির আলো আলাদাভাবে দেখতে পারি না। একের আলো অপরের সাথে মিশে যায়, আমরা সেটা আলাদাভাবে দেখতে পারি না। একে রাজস জ্ঞান বলে।

18.22

য়ত্তু কৃত্স্নবদেকস্মিন্ , কার্যে সক্তমহৈতুকম্
অতত্ত্বার্থবদল্পং(ঞ্চ)চ,তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥22॥

যে-জ্ঞানের দ্বারা কোনো একটি কার্যরূপ দেহেই সম্পূর্ণের মতো আসক্তি জন্মায়, সেই যুক্তিবিহীন অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলে জানবে। ২২

শ্রী ভগবান বলেন, যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি বিশেষ কার্যে সম্পূর্ণ সদৃশ আসক্তির উদয় হয় এবং যা যুক্তি বর্জিত এবং সাত্ত্বিক অর্থ বর্জিত এবং তুচ্ছ তাকে তামসিক জ্ঞান বলে। তার মধ্যে জানার কোনো কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা নেই। একজন তামসিক ব্যক্তি নিদ্রা এবং নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যস্ত থাকে। এমন ব্যক্তিকে ভগবান অজ্ঞানী বলেন না কারণ অজ্ঞান শব্দটির মধ্যে জ্ঞান শব্দটিও তো আছে। এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছ বলে। এই ধরনের মানুষেরা গভীর অন্ধকারে লিপ্ত থাকে, কারো প্রতি তাদের কোন অনুভূতি নেই। এই ধরনের জ্ঞান, যা নিদ্রিত, তাকে তামসিক জ্ঞান বলা হয়।
ভগবান রাজসিক কর্ম এবং তামসিক কর্ম সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করেছেন।

18.23

নিয়তং(ম্) সঙ্গরহিতম্ ,অরাগদ্বেষতঃ(খ্) কৃতম্
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম, য়ত্তত্সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥23॥

যে-কর্ম শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং কর্তৃত্বরহিত ব্যক্তির দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য তথা রাগ-দ্বেষ- -বর্জিত হয়ে করা হয় তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়। ২৩

শ্রী ভগবান বলেন, যে কাজ শাস্ত্র বিধি অনুসার করা হয়েছে এবং কর্তা অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে এবং ফলের কামনা না করে, আসক্তি ও দ্বেষ ব্যতিরেকে কর্ম সম্পাদন করেছেন, সেই কর্মকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে।

নিয়তম কর্মঃ: প্রথম - শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় - স্বভাবগত কর্ম, সহজ কর্ম।

সঙ্গরহিতম্ : আসক্তি থেকে মুক্ত এবং স্বার্থরহিত (নিঃস্বার্থ)। শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী নিত্যকর্ম করা উচিত, আপনার স্বভাব অনুযায়ী হওয়া উচিত, নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত এবং অহংকার থেকে মুক্ত এবং রাগ-দ্বেষ ভাব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

অফল-প্রেপ্সুনা: প্রত্যাশা ছাড়া, কোনো ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই যে কাজ করা হয়। ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করা উচিত নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বারবার বলা হয়েছে যে ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে দিন। ফল প্রাপ্ত করার ইচ্ছা ত্যাগ করুন।

এর অর্থ এই নয় যে ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, সেই ইচ্ছা থাকবে কিন্তু কাজ করার সময় সেই কথা মাথায় রাখা উচিত নয়। সেই সময় আমাদের শুধুমাত্র কাজের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত। যখন আমরা নিজের কাজ পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে করি তখন ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ : যদি আমরা আমের বীজ পুঁতে দিই, তাহলে আমই পাব কিন্তু আমরা যদি বারবার গিয়ে দেখতে থাকি যে গাছে ফল এসেছে কি না, যদি দেখি যে ফল আসেনি, তাহলে মাটি খুঁড়ে বীজ পরীক্ষা করি, তাহলে সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায় এবং গাছে আর ফল আসবে না। অন্যদিকে আমরা যদি মনে করি যে ফলটি যখন আসার তখনই আসবে এবং আমাদের জীবদ্দশায় যদি ফল নাও আসে, তবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই ফল খেতে পারবে, তাহলে গাছে ফল ঠিক সময়েই আসবে।

আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে আইআইটি-তে ভর্তির ইচ্ছা নিয়ে পড়াশোনা করে এবং তাতে সফলতা না পেলে ডিপ্রেশনে চলে যায় এবং কখনও কখনও আত্মহত্যাও করে বসে। কিন্তু তারা যদি জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং চেষ্টা করে যায়, তাহলে জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আইআইটিতে ভর্তি হওয়াও সহজ হয়ে যাবে।

প্রত্যাশা ছাড়াই জ্ঞান অর্জন বা যে কোনো কাজ করা উচিত। প্রত্যাশার কারণে চিন্তা-ভাবনা বাড়ে, প্রত্যাশা না থাকলে মানসিক চাপও থাকে না এবং সেই কারণে পরিণামও ভালো হয়। অর্জুন অত্যধিক মানসিক চাপের মধ্যে ছিলেন এবং এই সময়ে ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাকে সে চাপ থেকে মুক্ত করা। যদি কোন ব্যক্তি অত্যধিক মানসিক চাপের মধ্যে থাকে, তাহলে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তার ভগবদ্গীতা পড়া এবং হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

আমরা যখন ফলের প্রত্যাশা নিয়ে কোনো কাজ করি, ফল আমাদের থেকে দূরে চলে যায়। নিজের লক্ষ্যে স্থির হয়ে কাজ করা উচিত। প্রসন্নচিত্তে সাধনা করা উচিত। যখন আমরা সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে আনন্দ পাই, তখন আমরা নিশ্চিত নিজের গন্তব্যে পৌঁছাই। তাই কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই সাধনা করে যাওয়া উচিত। আমরা যদি প্রত্যাশা নিয়ে কোনো কাজ করি তবে কেবল দুঃখ প্রাপ্ত করি। প্রত্যাশা বিনা কাজ করলে আনন্দের অনুভূতিও বাড়ে। C হল B এবং D এর মধ্যে। B মানে জন্ম(Birth) আর D মানে মৃত্যু(Death)। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে C আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা (Choice) আপনার ইচ্ছা যে আপনি কীভাবে জীবন অতিবাহিত করবেন। এটি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যে আপনি নিরপেক্ষ ভাব নিয়ে আনন্দপূর্বক জীবন কাটাবেন না ফলের প্রত্যাশায় দুঃখী হয়ে বেঁচে থাকবেন।

আনন্দের ঝর্ণা সবার ভিতরেই প্রবাহিত হতে থাকে, কিন্তু সেটা বাইরে বের করে আনতে হবে। সুখ আর আনন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুখে থাকলে আমরা ঘুমাই না কিন্তু আনন্দে আমরা পরিতৃপ্তির সাথে ঘুমাই। যাদের মধ্যে এই আনন্দের ভাব থাকে, তারা সাত্ত্বিক কর্ম করেন। কর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, মনের ভাব বদলাতে হবে। যখন আমরা নিরপেক্ষ ভাব নিয়ে কর্ম করি তখন আমরা আনন্দ প্রাপ্ত করি এবং এটিই সাত্ত্বিক কর্ম। এতে আমরা অবশ্যই ফল প্রাপ্ত করি, তবে আমাদের ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্ম করা উচিত নয়।

18.24

য়ত্তু কামেপ্সুনা কর্ম, সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ
ক্রিয়তে বহুলায়াসং(ন), তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥24॥

কিন্তু বহু কষ্টসাধ্য, ফলকামনাযুক্ত বা অহঙ্কারযুক্ত পুরুষের দ্বারা যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাকে রাজস কর্ম বলা হয়। ২৪

শ্রী ভগবান বলেছেন যে যে কাজটি কঠোর পরিশ্রমের সাথে যুক্ত থাকে, ভোগ-বাসনার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা অহংবোধে পূর্ণ ব্যক্তি দ্বারা করা হয়, সেই কাজটি হলো রাজস কর্ম। কেউ কেউ অত্যন্ত দম্ভ ও অহংকারের সাথে

ভাগবত পাঠের আয়োজন করে। তার মনের মধ্যে এই অনুভূতি থাকে যে এই আমি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত করেছি, এমন লোকেরা এর থেকে কিছু প্রাপ্ত করে না। অহংবোধ থেকে করা কোন কাজ ফল দেয় না। আমরা যে কাজই করি না কেন, আমরা শুধুই নিমিত্ত মাত্র। ভগবান আমাদের এই কাজের জন্য মনোনীত করেছেন, তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আপনি কি ধরনের কাজ করছেন তা আপনার মনের ভাবের উপর নির্ভর করে।

ইঁদুর যেমন শস্যের দানার জন্য পাহাড়কে কুড়ে কুড়ে খায়, তেমনি রাজসিক প্রবৃত্তির ব্যক্তিরা নিজের মিথ্যা প্রতিপত্তির জন্য পুরো পর্বত তুলে নিতে পারে।

18.25

অনুবন্ধং(ঙ্) ক্ষয়ং(ম্) হিংসাম্, অনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্
মোহাদারভ্যতে কর্ম, য়ত্তত্তামসমুচ্যতে॥25॥

ভাবী শুভাশুভ ফল, ধনক্ষয়, শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও সামর্থ্যের বিচার না করে কেবল অবিবেকবশতঃ যে কর্ম করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলা হয়। ২৫

শ্রী ভগবান বলেছেন, যে কর্ম পরিণাম, সম্ভাব্য ক্ষতি বা অহিংসা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র অজ্ঞতা থেকে আরম্ভ করা হয়, তাকে তামস কর্ম বলে।
জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জী বলেছেন যে এটি জলের উপর রেখা আঁকার মত, যার কোন অর্থ নেই, তামসিক প্রকৃতির লোকেরা এই ধরনের কর্ম করে থাকে। এই প্রকার মানুষেরা দইয়ের ঘোল থেকেও মাখন বের করার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোল থেকে মাখন তৈরি করা যায় না। তারা ছাইয়ের মধ্যেও ফুঁ মেরে সোনা খোঁজার চেষ্টা করে। ছাইয়ের পাহাড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও সোনা পাওয়া যায় না। এই ধরনের লোকেরা অজ্ঞ, মূর্খ। বালি ঘষে তেল পাওয়া যায় না। ধানের তুষ থেকে শস্য পাওয়া যায় না, তার জন্যে ধান ভানতে হয়। আকাশে তীর নিক্ষেপ করে বাতাসকে ধরার জন্য ফাঁদ ছুড়ে মারে। এ ধরনের অর্থহীন কর্মকাণ্ডে এইপ্রকারের মানুষ সারা জীবন অতিবাহিত করে।
হে ভগবান, আমাদের ওপর কৃপা বর্ষণ করুন যাতে আমাদের জীবন যেন নিরর্থক না কাটে। আমাদের জীবন সাত্ত্বিক কর্মে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

হে প্রভু, এমন কৃপা হোক যে জীবন অর্থহীন হয়ে না যায়।
এই মন কত কিছুই করিয়ে নেয়, আর কিছু না হোক মানুষকে যেন আপন করে নিতে পারি।
হে প্রভু, আমার হাত দিয়ে পুণ্যকর্ম সম্পাদন হোক এবং আমি যেন একজন সাত্ত্বিক কর্তা হয়ে উঠি।

18.26

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী,ধৃত্যুত্সাহসমন্বিতঃ
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ(খ্),কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥26॥

ফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বাভিমানরহিত, ধৈর্যশীল, উদ্যমযুক্ত এবং ক্রিয়মান কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন ও অসিদ্ধিতে বিষাদরহিত কর্তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলা হয়। ২৬

শ্রী ভগবান বলেন যে কর্তা আসক্তি মুক্ত, অহংকারের উর্দ্ধে থাকেন, ধৈর্যশীল, উদ্যমী এবং নিজের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সদা প্রস্তুত, কর্ম সিদ্ধ হলেও তার কোন হর্ষ-উল্লাস নেই এবং যদি কার্য বিফল হলেও কোনো দুঃখ-অনুতাপ নেই, এরূপ কর্তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলা হয়।

বুদ্ধিকে স্থির রাখতে হলে মনকে প্রসন্ন রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন মনে প্রসন্নতা থাকলে সেই কাজ অবশ্যই আনন্দপূর্বক ভাবে করা সম্ভব হয়। আমাদের প্রসন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

সর্বদা স্মিতহাস্য মুখে থাকতে হবে। কেউ কিছুই বলুক না কেন, শান্তভাবে তার কথা শুনতে হবে। হাসিখুশি মানুষকে সবাই পছন্দ করে। সদা উদ্বিগ্ন, চিন্তিত মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। সদাপ্রসন্ন, হাসি-খুশি মানুষ ভগবানেরও বেশি প্রিয়। যে সমস্ত মানুষ সব পরিস্থিতিতে শান্ত থাকে, তারাই সাত্ত্বিক কর্তা।

18.27

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সু:(র্), লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ
হর্ষশোকান্বিতঃ(খ্)কর্তা,রাজসঃ(ফ্) পরিকীর্তিতঃ॥27॥

বাসনাকুলচিত্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী, পরপীড়ক, বাহ্যান্তর শৌচহীন, ইষ্টপ্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিষাদযুক্ত—এইরূপ কর্তাকে রাজস কর্তা বলা হয়। ২৭

শ্রী ভগবান বলেছেন যে কর্তা আসক্তিতে পূর্ণ, ফল কামনা করে, লোভী এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার স্বভাব, হর্ষ ও বিষাদে লিপ্ত থাকে, যে কর্তার মধ্যে সমত্ব ভাব নেই, তাকে রাজসী কর্তা বলে। মনের আকাঙ্খা যদি দ্রুত ধাবমান হয়, তবে দুঃখ-শোক অতি অবশ্যই তাকে অনুসরণ করবে। সুখ আর দুঃখ একটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থ উপার্জন করা খারাপ নয়, তবে অর্থ উপার্জনের দৌড়ে আমাদের এতটা মগ্ন হওয়া উচিত নয় যে আমরা নিজের পরিবারের প্রতি মনোযোগ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ি। আমরা নিজের সন্তানের মধ্যে মূল্যবোধ দেওয়ার সময় পাই না কারণ আমরা অর্থের পিছনে দৌড়োতে থাকি আর ভাবি আমরা অনেক অর্থ উপার্জন করব, আমরা সুখী হবো। কিন্তু আমরা যদি পরিবারের প্রতি মনোযোগ না দিই এবং আমাদের সন্তানদের মূল্যবোধ না দিই, তাহলে আমাদের সন্তানরা বহু কষ্টে উপার্জিত সেই টাকা মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট করে ফেলবে। আমরা ভাবি টাকা এলে সুখ আসবে, কিন্তু সুখের পর দুঃখও যে আসবে, সেটা বুঝি না। সুখের শেষ দুঃখে হয়, কিন্তু আনন্দের শেষ পরমানন্দে হয়।
উপরোক্ত গুণাবলী যুক্ত কর্তাদের রাজস কর্তা বলা হয়।

18.28

অযুক্তঃ(ফ্) প্রাকৃতঃ(স্) স্তব্ধঃ(শ্), শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ, কর্তা তামস উচ্যতে॥28॥

বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসংস্কৃত বুদ্ধি, অনম্র, ধূর্ত, পরবৃত্তিনাশক, সদা বিষণ্ন, অলস ও দীর্ঘসূত্রী কর্তাকে তামস কর্তা বলা হয়। ২৮

শ্রী ভগবান বলেন, যে অযুক্ত অর্থাৎ যে কিছুতে যুক্ত নয়, সে কোনো কাজের নয়, সে অমনোযোগী, অসভ্য, অশিক্ষিত, অহংকারী, একগুঁয়ে, অলস এবং যে তার উপকার করে, সে তারই ক্ষতি করে। এই ধরনের ব্যক্তি সবসময় অশান্তিতে ভোগে এবং আজকের কাজ আগামীকালের জন্য স্থগিত রাখে। যদি কারো মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলীর একটিও থাকে, তবে এমন কর্তাকে তামস কর্তা বলা হয়।

এখানে তামস কর্তার প্রবৃত্তি একটি গল্পের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধু নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে দীর্ঘসূত্রী (অর্থাৎ যিনি যখন একটি কাজ শুরু করেন, তখন সেই কাজ শেষ করতে দীর্ঘ সময় নেন) ছিল, অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, বিশেষ করে তার স্ত্রীর উপর। একদিন তার মাথা ব্যাথা করছিল, সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো এখন আমার কি করা উচিত। স্ত্রী বললো ডাক্তার দেখাও। সে আবার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো, গ্রামের ডাক্তারের কাছে যাবো নাকি শহরের ডাক্তারের কাছে। তার স্ত্রী শহরের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বললো । লোকটি শহরের ডাক্তারের কাছে গেল, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, বিশেষ কিছুই হয়নি, আপনার অ্যাসিডিটি হয়েছে, আমি আপনাকে এই দুটি ওষুধের বড়ি দিচ্ছি, খাওয়ার সময় খেয়ে নেবেন।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার বাবু, খাওয়ার সময় মানে খাবার আগে খাব নাকি খাওয়ার পরে।

ডাক্তার বলেন এই ওষুধের বড়িটি খাওয়ার আগে খাবে এবং অন্য বড়িটি খাওয়ার পর খাবে।
রোগী আবার জিজ্ঞেস করল, ডাক্তারবাবু, এই বড়িটা কি চিবিয়ে খেতে হবে নাকি গিলে খাব?
ডাক্তার বললেন এই বড়িটি গিলে খেতে হবে, কারণ এটা খুব তেতো, চিবিয়ে খাওয়া যাবে না।
রোগী বললো ঠিক আছে, কি দিয়ে গিলতে হবে।
ডাক্তার বললেন- দুধের সাথে গিলে খেয়ে নিও।
ঠিক আছে ডাক্তারবাবু, কতটা দুধ নিতে হবে, এক বাটি, এক গ্লাস না একটি গামলা।
ডাক্তার বললেন- এক বাটিই যথেষ্ট, না হলে বদহজম হবে। দুধ ঠাণ্ডা না গরম হওয়া উচিত?
ডাক্তার বললেন- ঈষৎ গরম দুধ হলেই চলবে।
ডাক্তারবাবু, দয়া করে আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলুন দুধটা গরুর হওয়া চাই নাকি মহিষের।
ডাক্তার তখন বিরক্ত হয়ে বললেন, ছাগলের দুধও হলেও চলবে, এখন আপনি বাড়ি যান।
ডাক্তারবাবু, আরেকটা কথা বলুন, দাঁড়িয়ে খাবো নাকি বসে খেতে পারি।
ডাক্তার বললেন, বসেই খেতে হবে, কিন্তু এখন উঠে দাঁড়াও, এখান থেকে বিদেয় হও এবং আমার পারিশ্রমিক দিয়ে যাও।
ডাক্তারবাবু, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমাকে ঠিক করে বলুন আমি নিজের হাতে ওষুধ খাবো নাকি আমার স্ত্রীর হাত দিয়ে খাবো।
ডাক্তার বললেন- আমার পারিশ্রমিক ১০০ টাকা দিয়ে এখান থেকে যাও।
ডাক্তারবাবু, ১০০ টাকার একটা নোট দেব নাকি খুচরো করে দেব ?
ডাক্তার সাহেব এতক্ষণে খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন, তিনি তার ড্রয়ার খুলে ৫০ টাকার দুটি নোট বের করে তাকে দিয়ে বললেন, এগুলো নিয়ে এখন থেকে যাও।
রোগী বেচারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে বাইরে এসে নোট দুটির দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখে আবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে কেন এই টাকা কেন দিলেন?
ডাক্তার বললেন, ৫০ টাকা দিয়ে ওষুধ কিনুন আর বাকি ৫০ টাকা রিকশাওয়ালাকে দেবেন, এখন আপনি এখান থেকে যান।
ডাক্তারবাবু, রাগ করবেন না, শেষ একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, আমাকে বলুন কোন ৫০ টাকা দিয়ে ওষুধ কিনতে হবে আর কোনটা ৫০ টাকা রিকশাওয়ালাকে দিতে হবে।

এই ধরনের কর্তাদের বলা হয় তামস কর্তা। ভগবান অর্জুনকে এটা বুঝিয়ে দিলেন।

এর সাথেই বিবেচন সত্র শেষ হয় এবং শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব।

::প্রশ্নোত্তর পর্ব::

প্রশ্নকর্তা: কমলেশ দিদি
প্রশ্ন: আমরা কাকে দান করা উচিত?
উত্তর: ভগবান বলেছেন, সুপাত্রকে দান করা উচিত, যারা অযোগ্য তাদের নয়, যারা দেশের কল্যাণে কাজ করছেন তাদেরও দান করা উচিত, দানের সময়টাও যেন যথাযথ ও উপযোগী হয়। আমরা যদি আমাদের দেশকে বাঁচাতে চাই, ভারতকে যদি ভারত হিসাবে রাখতে চাই, তবে এই চেষ্ঠা করতে হবে যেন বেদের সুর আমাদের দেশে অনুরণিত হয়, যাতে মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে এবং মানুষ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। বেদ রক্ষা হলে, বেদ-শাস্ত্র রক্ষা হলে আমাদের দেশ রক্ষা পাবে।
যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজতে গিয়ে যেন আমরা দানের অভ্যাসই না ভুলে যাই। তাই আমাদের উচিত অল্প অল্প করে দান করা যাতে এই অভ্যাসটি আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে না যায়।

প্রশ্নকর্তা: এস কে ত্রিপাঠী ভাইয়া
প্রশ্ন: অকর্তা - এই বিষয়টি আবার ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর: কর্তা হওয়ার ভাব বা অনুভূতিই হল কর্তা। আপনি যে কাজটি করছেন তা আপনার দ্বারা করা হচ্ছে না, সেই কাজটি আপনার শরীরের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। আপনি একটি আত্মা এবং যে কাজ করা হচ্ছে তা শরীরের মাধ্যমে

করা হচ্ছে, এই অনুভূতি মনে জাগ্রত হওয়া উচিত। এই অনুভূতি যখন আপনার মনে জাগ্রত হবে, তখন আপনি বলবেন যে আমি এই কাজটি করিনি, আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে। এই অনুভূতি নিয়ে কাজ করলে তা হয় অকর্ম এবং যে সেই কাজ করে সে অকর্তা হয়ে যায়। কাজটা একই থাকে কিন্তু মনের ভাব পরিবর্তন হওয়ার কারণেই কর্তা অকর্তা হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: সুশীলা দিদি
প্রশ্ন: যজ্ঞ করার সময়, আমরা যদি প্রতিটি মন্ত্রের পরে স্বাহা বলি, স্বাহার অর্থ কী?
উত্তর: স্বাহা অর্থাৎ এটা আমার নয় তোমার। আমরা মনে এই ভাব নিয়ে অগ্নিকে নিবেদন করি যে এটা আমার নয়, এটাই হলো স্বাহার অর্থ।

প্রশ্নকর্তা: মঞ্জু দিদি
প্রশ্ন: আমরা শুনেছি মা সবচেয়ে বেশি নিঃস্বার্থ ভাব নিয়ে সেবা করেন। চার প্রজন্ম ধরে আমি লক্ষ্য করেছি যে একজন মায়ের এই আশা থাকে যে তার একটি পুত্র হবে যে সে বড় হয়ে আমার সেবা করবে কারণ বিয়ের পর মেয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। কিভাবে মায়ের মন থেকে এই প্রত্যাশা দূর করা যায়?
উত্তর: দুঃখের অন্তিম পরিণতি হল দুঃখ। যারা এই মনোভাব নিয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রয়োজনের সময় তিনি তার ছেলের প্রতি বেশি নির্ভরশীল না মেয়ের প্রতি। আপনার প্রারব্ধে (ভাগ্যে) যা আছে, আপনি তাই প্রাপ্ত করবেন, পুত্র বা কন্যা। আপনার চারপাশে দেখুন, ছেলে হওয়ার পরও মানুষ বৃদ্ধাশ্রমে একাকী জীবন কাটাচ্ছে এবং তাদের ছেলে বাইরে থাকে, তাদের সাথে থাকে না। আমাদের স্বয়ংকেই বৃদ্ধ বয়সের ব্যবস্থা করা উচিত এবং আমাদের ছেলে বা মেয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। ছেলে মেয়ে উভয়কেই এক সমান দেখতে হবে।

ভগবান আমাদের সকলকে ভালবাসেন তাই আমাদের সাথে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য ভগবানকে দোষ দেওয়া ঠিক না। আসুন একটি গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝে নিই।
একবার এক যমদূত পৃথিবীতে এসেছিল। কারো প্রাণ নিয়ে সে যমলোকে ফিরে যাচ্ছিলো। যমদূত যার প্রাণ নিতে এসেছিল তিনি একজন মা ছিলেন, সে দেখলো মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে তার তিনটি সন্তান তার দেহকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল। এই দৃশ্য দেখে যমদূতের মন কেঁপে উঠল। সে সেই মায়ের প্রাণ নিয়ে যমলোকে পৌঁছে ভগবানকে বললো যে আপনি কত বড় অন্যায় করছেন জানেন, এনার তিনটি ছোট বাচ্চা আছে, তারা অনাথ হয়ে গেছে, আর আমি এই কাজ করতে পারবো না, দয়া করে আমার পদত্যাগপত্র নিন কারণ আমি জানি যে এই মায়ের শিশুরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পাবে, তাদের মৃত্যু হবে, তারপর আপনি আমাকেই তাদের প্রাণ নিতে পাঠাবেন, আমি এ কাজ করতে পারব না। ভগবান বললেন, এখানে পদত্যাগপত্র দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই। তুমি এই কাজ করবে না, ঠিক আছে, কিন্তু এর জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমাকে যমলোক ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং পৃথিবীতে গিয়ে বাস করতে হবে এবং সেখানে যখন তুমি তিনবার হাসবে, তখনই তুমি এখানে ফিরে আসতে পারবে। যমদূত বললো আমি পৃথিবীতে যেতে চাই না, এখানেই থাকতে চাই কিন্তু ততক্ষণে যমরাজ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যমদূত পৃথিবীতে নেমে দেখলো যে সেই সময় শীত কাল ছিল এবং তার শরীরে এক টুকরো কাপড়ও ছিল না। সে ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলো, সেখানে এক ব্যক্তি এসে তাকে কাঁপতে দেখে তার পশমের গরম জামা কাপড় তাকে পরিয়ে দিল। যমদূত বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও? লোকটি তার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এল। খাওয়ার পর যমদূত বললো, তুমি আমাকে বস্ত্র দিয়েছ, খাবার দিয়েছো, এখন আমাকে থাকার জন্য জায়গাও দাও। লোকটি বলল, "আমার বাড়িতে তুমি কি কাজ করতে পারবে?" যমদূত বললো, "তুমি যে কাজই কর, তাতে আমি তোমাকে সাহায্য করব।" লোকটি মুচির কাজ করতো, সে বললো, ঠিক আছে, তুমি আমার বাড়িতে এসে থাক। লোকটি যমদূতকে নিয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছলে তার স্ত্রী তার উপর খুব রেগে যায় ও বলে, আমাদের বাড়িতে দু'জনের জন্যেও পর্যাপ্ত খাবার নেই, আর তুমি আরো একজনকে নিয়ে এসেছো। একথা শুনে যমদূত উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো। তাই দেখে লোকটি বলল, আমার স্ত্রী আমার উপর রেগে গেছে আর আপনি হাসছেন, ব্যাপার কি? যমদূত বললেন, এখন বলতে পারব না, আমি তিনবার হাসার পর বলবো যে আমি কেন হাসছি।

যমদূতও মুচির সাথে চপ্পল এবং জুতা তৈরি করতে শুরু করে। সে যে জুতা এবং চপ্পল তৈরি করতো তা অত্যন্ত মজবুত ও সুন্দর মানের ছিল, সেই জুতোগুলি চড়া দামে বিক্রি হতে লাগলো। ধীরে ধীরে মুচি অনেক ধন-সম্পত্তি অর্জন করতে লাগলো, তার বড় বাড়ি তৈরি হল।

একদিন সেই দেশের রাজা সেখানে এসে মুচিকে কিছু পরিমাণ চামড়া দিয়ে বললেন, এটা খুবই মূল্যবান চামড়া, আমার এই চামড়ার জুতা পরার খুব ইচ্ছা, তাই তুমি আমার জন্য একজোড়া জুতা তৈরি করে দাও, চপ্পল নয়। মুচি সেই চামড়া যমদূতকে দিয়ে বললো, মহারাজার জন্য জুতা তৈরি করতে হবে, ভুলেও চপ্পল তৈরি করবে না। কিন্তু যমদূত রাজার জন্য চপ্পল তৈরি করে দিলো। মুচি তা দেখে খুব অসন্তুষ্ট হলো কারণ রাজা তাকে এরজন্য শাস্তি দেবেন। মুচি বললো, এ তুমি কি করলে? আমি তোমাকে জুতা বানাতে বলেছি। তুমি চপ্পল কেন তৈরি করেছো ? তখন এক ব্যক্তি রাজপ্রাসাদ থেকে এসে বলল, রাজার মৃত্যু হয়েছে। তুমি সেই চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করো নি তো ? এখন সেই চামড়া দিয়ে চপ্পল বানিয়ে দাও কারণ সেই দেশের প্রথা অনুযায়ী মৃত্যুর পর রাজাকে চপ্পল পরিয়ে শেষকৃত্য করা হতো। মুচি লোকটিকে চপ্পলটি দিয়ে বলল যে আমি তো চপ্পলই বানিয়েছি, লোকটি সেটা নিয়ে বিদায় নিলো।

কিছু দিন পর রাজপ্রাসাদ থেকে রাণী মুচিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তার ছেলেদের বিয়ে হচ্ছে, এসে জুতার মাপ নিয়ে যাও। মুচি তার পুরানো কারিগর অর্থাৎ যমদূতকে রাজকুমারদের পায়ের মাপ নেওয়ার জন্য রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। রানী বললেন, আমার তিন পুত্রবধূরও পায়ের মাপ নিয়ে যাও এবং তাদের জন্যও জুতা বানিয়ে আনো। যমদূত যখন তিন রাজকন্যার পায়ের মাপ নেওয়া শুরু করলো, তখন সে লক্ষ্য করলো যে তিনজনেরই পায়ের মাপ একই রকম। তখন সে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তিনজনকে দেখতেও একই রকম। যমদূত জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কে? তখন তিন রাজকন্যা বলল যে আমরা আমাদের বাবা-মাকে কখনো দেখিনি, কিন্তু শুনেছি লোকে বলে যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তখন আমাদের মা মারা গেছেন। আমাদের গ্রামের মহাজন ও তার স্ত্রী আমাদের লালন-পালন করেছেন এবং তাদের জন্যেই আজ আমরা রাজপরিবারে বিবাহের যোগ্য হয়েছি। একথা শুনে যমদূত হাসতে লাগলো এবং মনে মনে বললো একেই নিয়তি বলে। সেই মা যখন প্রাণ হারায় তখন আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলে তার কন্যারা আজ রাজবধূ হয়ে উঠত না। মা চলে যাওয়ার কারণেই এই মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

যখন কোনো প্রতিকূল ঘটনা ঘটে, তার পেছনে কোনো না কোনো কারণ নিশ্চয়ই থাকে, যা আমরা জানি না। কিন্তু সেসব বিষয়ে আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি, কাঁদতে শুরু করি এবং দুঃখ পাই। যমদূত মুচির সামনে হাত জোড় করে বললো, আজ আমি তৃতীয়বার হাসতে পেরেছি, আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। আমিই এই কন্যাদের মায়ের জীবন কেড়ে নিয়েছিলাম। সেদিন আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, অনেক কেঁদেছিলাম, এমনকি আমার কাজকে খারাপ বলে সমালোচনা করেছিলাম, কিন্তু আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এই বলে যমদূত অদৃশ্য হয়ে গেল। একেই প্রারব্ধ(নিয়তি) বলে।

প্রার্থনা ও হনুমান চালিসা পাঠের মাধ্যমে অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আজকের সত্রের সমাপন হলো।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||